বামা

(গল্পগ্রন্থ – তালনবমী)

আমার যখন বাইশ-চব্বিশ বছর বয়েস তখন নানা দেশ বেড়ানোর একটা কাজ জুটে গেল আমার অদৃষ্টে। তখন আমি দৈব ঔষধের মাদুলি বিক্রি করে বেড়াতুম। চুঁচড়োর শচীশকবিরাজের তরফ থেকে মাইনে ও রাহাখরচ পেতুম। অল্প বয়সের প্রথম চাকরি, খুব উৎসাহেরসঙ্গেই করতুম।

আমাকে কাপড়চোপড় পরতে হত সাধু ও সাত্ত্বিক বামুনের মতো। ওটা ছিল ব্যবসায়েরঅঙ্গ। গিরিমাটির রঙে ছোপানো কাপড় পরনে, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, গলায় মালা, হাতে থাকত একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ, তারই মধ্যে মাদুলি ও অন্যান্য ওষুধ থাকত।

বছরতিনেক সেই চাকরি করি, তারপর শরীরে সইল না বলে ছেড়ে দিলুম।

একবার যাচ্ছি বর্ধমান জেলার মেমারি স্টেশন থেকে মাখমপুর বলে একটা গ্রামে। এটামাদুলি বিক্রির জন্যে নয়, মাখমপুরে শচীশ কবিরাজের শ্বশুরের বাড়ি। সেখানকার জমিজমারওয়ারিশান দাঁড়িয়েছিলেন শচীশবাবু—শ্বশুরের ছেলেপুলে না থাকায়। আমাকে পাঠিয়েছিলেনপৌষ-কিস্তির সময় জমিজমার খাজনা যতটা পারি আদায় করে আনতে।

কিন্তু তা হলেও পরনে আমার গেরুয়া কাপড়, হাতে মাদুলি ও ওষুধভরা ক্যাম্বিসের ব্যাগ ইত্যাদি সবই ছিল, যদি পথেঘাটে কিছু বিক্রি হয়ে যায়, কমিশনটা তো আমি পাব!

কখনো ও অঞ্চলে যাইনি। মেমারি স্টেশনে নেমে বেলা দুটোর সময়ে হাঁটছি তো হেঁটেই চলেছি, পথ আর ফুরোয় না। এক জায়গায় একটা ছোট বাজার পড়ল, সেখানে কিছু খেয়ে নিয়েআবার পথ হাঁটি।

গ্রামে গ্রামে ওষুধ বিক্রি করে বেশ কিছু রোজগারও করা গেল, দেরিও হল বিশেষ করে সেই জন্যে। আর একটা বাজার পড়ল, সেখানে দোকনদারদের কাছে শুনলুম, আমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছুতে অন্তত রাত ন'টা বাজবে। কিন্তু সকলেই বললে, "সন্ধের পরে আগে গিয়ে আর পথ হাঁটবেন না, ঠাকুরমশায়। এই সব দেশে ফাঁসুড়ে ডাকাতের বড় ভয়, বিদেশী দেখলে মেরেধরে যথাসর্বস্ব কেড়ে নেয়। প্রায়ই বনের ধারে বড় বড় মাঠের মধ্যে ঘাঁটি মেরেবসে থাকে। সাবধান, একটা দীঘি পড়বে মাঠের মধ্যে ক্রোশ তিনেক দূরে, জায়গাটা ভালনয়..."

বড় বড় মাঠের ওপর দিয়ে রাস্তা। সন্ধ্যা প্রায় হয়-হয়, এমন সময় দূরে একটা তালগাছঘেরা দীঘি দেখা গেল বটে। আমার বুক ঢিপঢিপ করে উঠল। দীঘির ও-পাশে সঞ্জয়পুর বলেএকটা গ্রাম, সেখানেই রাত্রের জন্যে আশ্রয় নেওয়ার কথা বাজারে বলে দিয়েছিলো। কিন্তু সন্ধ্যা তো হয়ে গেল তালদীঘির এদিকেই—অন্ধকার হবার দেরি নেই, কোথায় বা সঞ্জয়পুর, কোথায় বা কি?

মনে মনে ভারি ভয় হল। কি করি এখন? সঙ্গে মাদুলি ও ওষুধ বিক্রির দরুন অনেক টাকা। পরক্ষণেই ভাবলাম, কিছু না পারি দৌড়োতে তো পারব! না-হয় ব্যাগটাই যাবে,—প্রাণ তো বাঁচবে!

ভয়ে ভয়ে দীঘির কাছাকাছি তো এলুম।...বড় সেকেলে দীঘি, খুব উঁচু পাড়, পাড়ের দু'ধারে বড় বড় তালগাছের সারি—তার ধার দিয়েই রাস্তা। দীঘির পাড়ে কিন্তু লোকজনের সম্পর্ক নেই।যে ভয় করেছিলুম, দেখলুম সবই ভুয়ো। মানুষ মিথ্যে যে কেন এ-রকম ভয় দেখায়!

প্রকাণ্ড দীঘিটার পাড় ঘুরে যেমন তালবনের সারি ও দীঘির উঁচু পাড়কে পেছনে ফেলেছি, সামনেই দেখি ফাঁকা মাঠের মধ্যে দূরে একটা গ্রাম লি-লি করছে—নিশ্চয় ওটা সেই সঞ্জয়পুর!..বাঁচা গেল বাবা! কি ভয়টাই দেখিয়েছিল লোকে! দিব্যি ফাঁকা মাঠ, কাছের লোকেরবসতি, গাঁয়ের গোরুবাছুর চরছে মাঠে—কেন এ সব জায়গায় বিপদ থাকবে?

আমি এই রকম ভাবছি, এমন সময় তালপুকুরের ওদিকের পাড়ের আড়ালে যে পথটা, সেই পথ বেয়ে একজন বৃদ্ধকে আমার দিকে আসতে দেখলুম। বৃদ্ধ বেশ বলিষ্ঠ গড়নের, এইবয়সেও মাংসপেশী বেশ সবল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ছোট একটা লাঠি।

বৃদ্ধ আমায় বললে, "ঠাকুরমশায় কোথায় যাবেন?"

"যাব মাখমপুর..."।

"মাখমপুর! সে যে এখনো তিন ক্রোশ পথ...কাদের বাড়ি যাবেন?"

"শচীশ কবিরাজের বাড়ি।"

"ঠাকুরমশায় কি কবিরাজমশায়ের গোমস্তা?"

"গোমস্তা নই, তবে যাচ্ছি জমিজমার কাজে বটে।"

"এ অঞ্চলে আর কাউকে চেনেন?...মশাইয়ের নিজের বাড়ি কোথায়?"

"আমি এদিকে কখনো আসিনি, কাউকে চিনিওনে। মাখমপুরেও নতুন যাচ্ছি.."

"সেখানেও কেউ তাহলে আপনাকে চেনে না?"

"না, কে চিনবে!"

আমার এই কথায় আমার যেন মনে হল বুড়ো একটু কি ভাবলে, তারপর আমায় বললে, "কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা বলি...রাত্রে আজ দয়া করে আমার বাড়িতে পায়ের ধুলোদিন। আমরা জাতে বারুই, জল-আচরণীয়, আপনার অসুবিধে হবে না। চণ্ডীমণ্ডপের পাশে বাইরের ঘর আছে, সেখানে থাকবেন, রান্নাবাড়া করে খাবেন...আসুন দয়া করে...

আমি বৃদ্ধের কথায় ভারি সন্তুষ্ট হলুম। সত্যিই তো, সেকালের লোকেরা অন্য ধরনেরশিক্ষায় মানুষ। অতিথি-অভ্যাগতদের সেবা করেই এদের তৃপ্তি। বৃদ্ধ এই প্রস্তাব না করলে রাঢ়-অঞ্চলের অজানা মেঠো পথ বেয়ে এই সুমুখ-আঁধার-রাতে আমায় যেতেই তো হতমাখমপুরে, তিন ক্রোশ হেঁটে!

গ্রামের পূর্বপ্রান্তে বড় মাঠের ধারে বৃদ্ধের বাড়ি। বৃদ্ধের নাম নফরচন্দ্র দাস। আমি চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে উঠতেই একটা কুকুর ঘেউঘেউ করে উঠল।

কুকুরের এই ডাকটা আমার ভাল লাগল না; এর আমি কোনো কারণ দিতে পারব না, কিন্তু এই কুকুরের চিৎকারের যেন একটা ছন্নছাড়া অমঙ্গলজনক অর্থ আছে—মঙ্গলসন্ধ্যায়কোনো গৃহস্থবাড়িতে আসিনি, যেন শ্মশানভূমিতে এসেচি...

বৃদ্ধের বাড়ি দেখে মনে হল বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাড়ির উঠোনে সারি সারি তিনটেবড় বড় ধানের গোলা—গোলার সঙ্গে প্রকাণ্ড গোয়ালঘর, বলদ ও গাইয়ে প্রায় কুড়ি-বাইশটা।অন্তঃপুরের দিকে চারখানা বড় বড় আটচালার ঘর। বাইরের এই চণ্ডীমণ্ডপ ও তার পাশে আরএকখানা কুঠরি।

আমার কথাটা ভাল করে বুঝতে গেলে এই কুঠরিটার কথা আর একটু ভাল করে শুনতেহবে। কুঠরিটিকে চণ্ডীমণ্ডপ-সংলগ্ন একটা কামরাও বলা যায়, কারণ একটা সরু রোয়াকের দ্বারা চণ্ডীমণ্ডপের পেছনদিকের সঙ্গে সংলগ্ন, অথচ দোর বন্ধ করে দিলে বাইরের বাড়ির সঙ্গে এর সম্পর্ক চলে গিয়ে এটা ভেতরবাড়ির একখানা ঘরের শামিল হয়ে দাঁড়ায়।

আমায় বাসা দেওয়া হল এই কুঠরিতে। কুঠরির একপাশে ছোট একটা চালা। সেখানে আমার রান্নার আয়োজন করে দিয়েছে। হাত মুখ ধুয়ে সুস্থ হয়ে আমি বিশ্রাম করচি।

গৃহস্বামী এসে বললে, "ঠাকুরমশায় রান্না চাপান, আর রাত করেন কেন?"

আমি রান্নাচালায় বসে রান্না চড়িয়ে দিতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি একটি বাড়ির বউ ভেতর থেকে একগাছা ঝাঁটা হাতে এসে আমার রান্নাচালার সামনে দিয়ে ঢুকল ও ঝাঁট দিতে লাগল।

কুঠরির দরজা খোলা, আমি যেখানে বসে সেখান থেকে কুঠরিটার ভেতর দেখা যায়।আমি দু-একবার বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলুম, বউটি ঝাঁট দিতে দিতে আমার দিকে চেয়ে চেয়েদেখচে। দু'তিনবার বেশ ভাল করে লক্ষ্য করে মনে হল, বউটি ইচ্ছে করেই আমারদিকে অমনকরে চাইচে।

আমি দস্তুরমতো অবাক হয়ে গেলুম। ব্যাপার কি? সম্পূর্ণ অপরিচিতা মেয়ে, পল্লীর গৃহস্থবধূ—এমন ব্যবহার তো ভাল নয়! কি হাঙ্গামায় আবার পড়ে যাব রে বাবা! কর্তাকে কাছে বসিয়ে রাঁধতে রাঁধতে গল্প করব নাকি?

এমন সময় বউটি ঝাঁট শেষ করে চলে গেল। কিন্তু বোধ হয় পাঁচ মিনিট পরেই আবার এল। দেখে মনে হল সে যেন খুব ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন, উত্তেজিত। এবারও সে কুঠরির মধ্যে ঢুকেএটা-ওটা সরাতে লাগল এবং আমার দিকে চাইতে লাগল, তারপর হঠাৎ রান্নাচালার দরজায় এসে চকিতদৃষ্টিতে চারদিকে চেয়ে কেউ নেই দেখে আমার দিকে আরো সরে এল এবং নিচুসুরে বললে, "ঠাকুরমশায়, আপনি এখনই এখান থেকে পালান, না হলে আপনি ভয়ানক বিপদেপড়বেন—এরা ফাঁসুড়ে ডাকাত, রাতে আপনাকে মেরে ফেলবে"—বলেই চট করে বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

শুনে তো আমি আর নেই! হাতের খুন্তি হাতেই রইল, সমস্ত শরীর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল—আর সারা হাত-পা অবশ ও ঝিমঝিম করতে লাগল। বলে কি! দিব্যি গেরস্তবাড়ি, গোলাগালা, ঘরদোর—ডাকাত কি রকম!

কিন্তু পালাবই বা কেমন করে? এখন বেশ রাত হয়েছে, সামনের চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধ বসে লোকজনের সঙ্গে কথা কইচে—ওখান দিয়ে যেতে গেলেই তো সন্দেহ করবে।

কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে গিয়েচি একেবারে—হাতে-পায়ে জোর নেই, কিছু ভাববারওশক্তি লোপ পেয়েছে। মিনিট পাঁচেক এমনি ভাবে কাটল—এমন সময়ে দেখি সেই বউটি আবারকি একটা কাজে কুঠরির মধ্যে ঢুকে খোলা দরজা দিয়ে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মেয়েটি কথা বলবার পূর্বেই আমি বললুম, "তুমি যে হও, তুমি পরম দয়াময়ী—বলেদাও কোন্ পথে কি ভাবে পালাব..."

বউটি চাপা গলায় বললে, "সেই জন্যেই এলুম। সব দেখে এলুম। পালাবার পথ নেই—ওরা ঘাঁটি আগলে রেখেচে..."

আমি বললুম, "তবে উপায়?"

মেয়েটি বললে, "একটা মাত্র উপায় আছে। তাও আমি ভেবে এসেচি। আমি এ-বাড়িতেআর ব্রহ্মহত্যা হতে দেব না—অনেক সহ্য করেচি, আর করব না...দাঁড়ান ঠাকুরমশায়, আর একবার বাড়ির মধ্যে থেকে আসি, নইলে সন্দেহ করবে।"

মিনিট পাঁচেক পরে বউটি আবার এল, চকিতদৃষ্টিতে চারদিকে চেয়ে বললে, "শুনুন আমার উপায়—এই কথা ক'টা মনে রাখুন। মনে যদি রাখতে পারেন, তবে বাঁচাতে পারব।...আমার নাম বামা, আমি এ-বাড়ির মেজবউ, আমার বাপেরবাড়ির গ্রামের নাম কুসুমপুর, জেলা বর্ধমান, থানা রায়না—বাপের নাম হরিদাস মজুমদার, জ্যাঠামশায়ের নাম পাঁচকড়ি মজুমদার, আমার দুই বোন, আমার দিদির নাম ক্ষান্তমণি, বিয়ে হয়েচে সামন্তপুর-তেওটা, বর্ধমান জেলা, শ্বশুরের নাম দুর্লভ দাস—সবাই জাতে বারুই। আমার বাবা, জ্যাঠামশায় সব বেঁচে আছেন, কিন্তু মা নেই..."

আমার তখন বুদ্ধি লোপ পেতে বসেচে—যা বলে মেয়েটি তাই করে যাই। এতে কিহবে? বউটি কিন্তু এক-একবার বাড়ির মধ্যে যায়, আবার অল্প দু'মিনিটের জন্যে ফিরে এসেআমায় তালিম দিয়ে যায়—" "মনে আছে তো? জ্যাঠামশায়ের নাম কি?"

আমি বললুম, "হরিদাস মজুমদার..."

“না না, পাঁচকড়ি মজুমদার, বাবার নাম হরিদাস মজুমদার...আমার দিদির নাম কি?

শ্বশুরবাড়ি কোন্ গাঁয়ে?...”

‘ক্ষান্তমণি। শ্বশুরবাড়ি হল—শ্বশুরবাড়ি...”

“আপনি সব মাটি করলেন দেখচি! সামন্তপুর-তেওটা, বলুন...”। “সামন্তপুর-তেওটা—শ্বশুরের নাম রামযদু দাস—দুর্লভরাম দাস...”

অবশেষে মিনিট দশ-বারোর মধ্যে আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে এসেচে।

বউটি বললে, “রান্না-খাওয়া করে নিন ঠাকুরমশায়, কোনো ভয় করবেন না। আমার বাপের বাড়ির নাম-ধাম যখন জানা হয়ে গেচে, তখন আপনাকে বাঁচাতে পেরেছি। এখন শুনুন, —খাওয়া-দাওয়ার পরেই শ্বশুরমশায়ের কাছে আমার বাপের বাড়ির পরিচয় দিয়েবলবেন—আপনি তাদের গুরুবংশ; আমার নাম বলে জিগ্যেস করবেন—আমার বিয়ে হয়েচেকোথায়, জানো নাকি? গলা যেন না কাঁপে, কোনোরকম সন্দেহ যেন না হয়...আমি চললুম, আবার আসব আপনি শ্বশুরকে বলবার পরে; কিন্তু দেরি করবেন না বেশি,বিপদ কখন হয়বলা তো যায় না!...”

রান্না-খাওয়া শেষ না করলেও তো সন্দেহ করতে পারে। রান্না-খাওয়া করতেই হল।রাত্রের অন্ধকার তখন বেশ ঘন হয়ে আসছে, রাত আন্দাজ দশটার কম নয়, আহারাদির পরনিজের কুঠরিতে বসেছি, আর আমার মনে হচ্ছে এ বাড়ির সবাই যেন খাঁড়ায়, রাম-দাতে শান দিচ্ছে আমার গলাটি কাটবার জন্যে!

এই সময় গৃহস্বামী স্বয়ং আমার জন্যে পান নিয়ে এল। বললে, “কি ঠাকুরমশায়, আহারাদি হল? এখন দিব্যি করে শুয়ে পড়ুন। মশারিটা টাঙিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, রাত হয়েছে আরদেরি করবেন না...”।

আমি বললুম, “হ্যাঁ, একটা কথা বলি...আমাদের এক মন্ত্রশিষ্য—বাড়ি কুসুমপুর, থানারায়না, নাম পাঁচকড়ি—ইয়ে, হরিদাস মজুমদার, তার একটি মেয়ের নাম বামা—এ দিকেইকোথায় বিয়ে হয়েছে! তারাও জাতে তোমাদের বারুই কিনা—তাই হয়তো চিনলেও চিনতেপারো। মেয়েটির জ্যাঠা দুর্লভরাম—ইয়ে পাঁচকড়ি—আমায় বলে দিয়েছিল মেয়েটির শ্বশুরবাড়ির খোঁজ করে একবার সেখানে যেতে...তা যখন এলুমই এ দেশে...”

আমার কথা শুনে বৃদ্ধ যেন কেমন হয়ে গেল, আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললে, “কুসুমপুরের হরিদাস মজুমদার? বামা?...আপনি তাদের চিনলেন কি করে?”

বামার কথা স্মরণ করে গলা না কাঁপিয়ে দৃঢ়স্বরে বললুম, “আমি যে তাদের গুরুবংশ—আমার বাবার ওরা মন্ত্রশিষ্য কিনা!”

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বললে, “বসুন, আমি আসচি...”

আমি একটা কুঠরির মধ্যে বসে রইলুম, সন্দেহ ও ভয় তখনো কিন্তু যায়নি, আর এরা যেগুরুদেবকেই রেহাই দেবে তা কে বলেচে!

কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ ফিরে এল, পেছনে পেছনে সেই বধূটি, আর একজন ষন্ডামার্কাগোছের যুবক এবং একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক—সম্ভবত বৃদ্ধের স্ত্রী।

বৃদ্ধ বললে, “এই যে বামা, ঠাকুরমশায়! আমারইমেজছেলের সঙ্গে...এই আমারমেজছেলে শম্ভু...গড় করো সব, গড় করো...মেজবউমা, দেখ তো, চিনতে পারো এঁকে?”

চমৎকার অভিনেত্রী বটে বামা! অদ্ভুত অভিনয় করে গেল বটে!

ঘোমটা খুলে হাসিমুখে সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে গলায় আঁচল দিয়ে।জীবনদাত্রী, দয়াময়ী বামা—আমার চোখে প্রায় জল এসে পড়ল।

তারপর সে রাত্রি তো কেটে গেল। খাবার জল দেবার ছুতো করে এসে বামা আমায়আশ্বাস দিয়ে গেল। বললে, 'বিপদ কেটে গিয়েছে; আমার চোখে না পড়লে সর্বনাশ হত, ভিটেতে ব্রহ্মহত্যে হত। অনেক হয়েছে—এই কুঠরিতে,—এই বিছানায়, এই মেঝেতে অনেক লাশ পোঁতা..."

আমার মনের অবস্থা বলবার নয়। বললুম, "পুলিশ কি গাঁয়ের লোক কিছু টের পায়না—কিছু বলে না?"

"কে কি বলবে? এ ফাঁসুড়ে ডাকাতের গাঁ। সবাই এ-রকম। আগে জানলে কি বাবাএখানে বিয়ে দিতেন? বিয়ের পর সব ধরা পড়ে গেল আমার কাছে। এখন আমার একটি সন্তানহয়েচে—এ পাপ-ভিটেয় বাস করলে তার অকল্যাণ হবে। ওকে বারণ করি, কিন্তু ও কি করবে? মাথার ওপর শ্বশুরমশায় রয়েচেন—পুরনো ডাকাত, দাদারা রয়েছে...আপনি ঘুমিয়েপড়ুন বাবাঠাকুর, আর ভয় নেই..."

সকাল হল। বিদায় নেবার সময় বৃদ্ধ আমায় পাঁচ টাকা গুরু-প্রণামী দিলে। বামাকেআড়ালে ডেকে বললুম, "তুমি আমার মা, আমার জীবনদাত্রী। আশীর্বাদ করি চিরসুখী হও মা.."

বামার মতো বুদ্ধিমতী নারী জীবনে আর আমার চোখে পড়েনি। কতকাল হয়ে গেল, এই বৃদ্ধ বয়সেও সেই দয়াময়ী পল্লীবধূটির স্মৃতিতে আমার চোখে জল এসে পড়ে, শ্রদ্ধায় মন পূর্ণ হয়ে ওঠে।